অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাস

সুমিতা চক্রবর্তী

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে বলা যায় এক বহুমুখী মানুষ এবং বিবিধ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ। যদিও কথাসাহিত্যিকরূপেই এই নিবন্ধে তাঁকে দেখা হবে। কিন্তু কথাসাহিত্য—বিশেষ করে উপন্যাসের সংরূপ স্বরূপতই বহুমুখী; এজন্য তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ের কয়েকটি দিক একটু তুলে ধরতে চাই।

তিনি একজন ভূ-পর্যটক। ঘুরেছেন বহু দেশ। তাঁর ভ্রমণকাহিনির নাম 'সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ', 'বন্ধুভরা বসুন্ধরা', 'পাহাড়ি গরিলার খোঁজে'। কেবল ঘুরেছেন নয়, ছবিও তুলেছেন। ফটোগ্রাফিতে সুদক্ষ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সচিত্র ভ্রমণ-বিবরণ দীর্ঘ কাল দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছে। এমন মানুষ বিরল যিনি ঘুরেছেন আন্টার্কটিকা, আলাস্কা, আফ্রিকা, মোঙ্গোলিয়া, চিন, মিয়ানমার, জর্ডন, ইজরায়েল, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বুলগেরিয়া। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভ্রমণ' নামের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং উচ্চমানের পত্রিকার বর্তমানে তিনি প্রধান সম্পাদক।

তিনি একজন চিত্র-শিল্পীও, একক চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে তাঁর একাধিক বার। একজন ঔপন্যাসিক ফটোগ্রাফার এবং চিত্রশিল্পী একইসঙ্গে— এই ব্যাপারটা ঔপন্যাসিককে একটু বিশিষ্ট করে তোলে। কারণ একটি উপন্যাসে আলোকচিত্রের মতো বিবরণের সঙ্গে চিত্রশিল্পের মতো কল্পনাবিস্তারও মিশে যেতে পারে এবং মিশে যায়। বিশেষ করে বিশ শতকে চিত্রশিল্পের যে চরিত্র আমরা দেখি সেখানে মনের গভীরতম তল থেকে উঠে আসা যন্ত্রণা এবং কখনও কখনও সুখও বিচিত্র কল্পরূপে দেখা দেয় পটের উপর। সেখানে ফটোগ্রাফি খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে ফটোগ্রাফির বাস্তবতা ভেঙেই সেই পরাবাস্তব কল্পচিত্র নির্মিত হয়। উপন্যাসেও এই রীতির পরিগ্রহণ আছে। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার লেখকেরা পথ দেখানোর পর একালের অনেক উপন্যাস এবং অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'বিষাদগাথা' পড়বার সময়ে এই অভিজ্ঞতার জন্য পাঠককে প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও অনেক পরিচয় আছে। তার মধ্যে একটি হল মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইকে একেবারে মূল থেকে তিনি অনুভব করেছেন। মানুষের জীবনের মূল সংকট যে অর্থ-উপার্জনের সংকট তা নিয়ে কি কোনও সংশয় আছে? মানুষই একমাত্র প্রাণী যার মস্তিষ্ক তাকে শিখিয়েছে নগ্ন শরীরকে আবরণে

ঢাকতে হয়; কাঁচ মাছ-মাংস খাওয়া যায় না; মাথার উপর একটা ছাদ থাকা দরকার। অতএব টাকার দরকার। কেন একজন সাহিত্যিক, একজন পর্যটক 'কর্মক্ষেত্র' (প্রকাশ ১৯৮০) এবং 'পেশাপ্রবেশ' নামের দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করবেন? যদি না তিনি অনুভব করে থাকেন ন্যূনতম উপার্জনবিহীন মানুষের অস্তিত্বের সংকট। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্পে নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীনের যন্ত্রণা খুব সোজা ভাষায়, খুব প্রত্যক্ষভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাবাস্তবতার স্পর্শ ব্যতিরেকে কঠোরভাবে ফুটে উঠেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের এই পলাতক ছাত্র ১৯৬৬ সালেই 'কবিতা-পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের নাম অক্ষয় করে রাখতে পেরেছেন। এই পত্রিকার গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৮১তে, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৯৮। একটি কবিতাকে ঘিরে একাধিক সাহিত্য-মনস্ক পাঠকের এবং কবিদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে এই পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র। ১৯৬৭তে সেই তরুণ বয়সেই দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন তিনি। পরে 'কালের কষ্টিপাথর' নামের এক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

আরও এক দিক আছে এই মানুষটির। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর 'শাদা ঘোড়া' (১৯৭৯), 'ঋষিকুমার' (১৯৭৯), 'হীরু ডাকাত' (১৯৮৬), 'গৌর যাযাবর' (১৯৯১), 'ভূতের বাঁশি' (২০০২), 'আমাজনের জঙ্গলে' (২০০১), 'বরফের বাগান' (২০১১), 'গরিলার চোখ' (২০১৪), 'পাখির খাতা' (১৯৯১), 'তালগাছের ডোঙা' (১৯৯১), 'আমার বনবাস' (১৯৯৩), 'হরিণের সঙ্গে খেলা' (১৯৯১), 'ছেঁড়া কাঁথার গল্প' (২০০৬) ইত্যাদি ছোটদের বই। 'ছেলেবেলা' (প্রথম প্রকাশ ১৯৮২) নামের একটি পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তিনি। ছোটদের জন্য যাঁরা লেখেন তাঁরা একটু অন্য ধরনের মানুষ হন— একথা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। অনেক লেখক আছেন যাঁরা ছোটদের জন্য লিখলেও ঠিক ছোটদের লেখক নন। কিন্তু অমরেন্দ্র চক্রবর্তী যখন এই বইগুলি লিখেছেন তখন সেগুলি ছোটদের মনের কথা অনুভব করেই লিখেছেন— যে-কোনও একটি বইয়ের পাতা খুললেই এই সত্য প্রমাণিত হবে।

অমরেন্দ্র নিজেও কবিতা লেখেন। 'বিক্ষত অন্বেষণ' (১৯৬২) 'নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে', 'মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা', 'ভূমিকম্পের রাত' তাঁর কয়েকটি কবিতা-বই। দুই-চার পংক্তির সূক্তিরত্নাবলির রীতিতে লেখা 'ক্ষণের বচন' (২০১৫) থেকে একটি দৃষ্টান্ত— 'দেশপ্রেম জুঁই বা চাঁপা/সভামঞ্চে যায় না মাপা।'

এখন কথাটা হল এতরকম কাজ তিনি করলেন কী করে? পারলেন কী করে? এবং করলেনই বা কেন?

এ বিষয়ে কেবল অনুমানই করা যায়। আমার মনে হয়েছে, তাঁর বিশ্ব-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষাই এই বহুমুখীনতার উৎস। তিনি বিশ্বভুবন দেখেছেন। এই বিচিত্র বিশ্বের কোণে কোণে কতরকমের মানুষ, কতরকমের সংস্কৃতি, কত বিচিত্র জীবনযাপন, কত

ধরনের লোকসংস্কৃতি। অথচ সর্বত্রই মানুষের ভেতরের ছবিটা এক— বাঁচতে হবে, জন্তুর মতো নয় মানুষের মতো। ভালোয় এবং মন্দে। সর্বত্রই শিশুরা এক। সর্বত্রই দুষ্কৃতীরা এক। এজন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি উপন্যাসে এসে পৌঁছলেন। কারণ উপন্যাসই সেই সংরূপ যা জীবনকে সর্বায়ত পরিসরে ধরতে চায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিষাদগাথা'— প্রকাশ ২০১৩।

বিভিন্ন কারণেই উপন্যাসটি যথার্থ পাঠককুলের কাছে আকর্ষক হয়েছে। সেই পাঠকদের অন্যতম হলেন দেবেশ রায়। যদি অন্য কোনও লেখকের সঙ্গে 'বিষাদগাথা' উপন্যাসটির তুলনা করতে হয় তাহলে দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) উপন্যাসটির নাম মনে আসতে পারে। এই তুলনা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করবে না। কারণ দুটি উপন্যাসের অভিমুখ আলাদা; অভীষ্টও পৃথক। কিন্তু দুটি উপন্যাসেরই বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে কিছু উপরি-সাদৃশ্য আছে।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের নামকরণেই লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি একটি অঞ্চলের বিবর্তন-কথা তুলে ধরবেন। অঞ্চল মানে অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি এবং অধিবাসীদের জীবন। 'বিষাদগাথা' উপন্যাসের নামে সে ধরনের কোনও স্থানপটের উল্লেখ নেই। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বালিসোনা নামের একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটি নদীরও উল্লেখ আছে। শুকিয়ে যাওয়া নদী— যা একশো বছর আগেও প্রবহমান ছিল। স্থানীয় লোকশ্রুতি এই নদীতেই ভেলা বেয়ে লখিন্দরকে নিয়ে ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিল বেহুলা। কারও মতে, এই নদীতেই জাহাজ ভাসিয়ে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রা। অর্থাৎ নদীটিকে মধ্যযুগের মনসা-কাহিনির সঙ্গে লগ্ন রাখা হয়েছে লোকমানসে। সে নদী এখন শুকনো মাঠ।

একটি অঞ্চল যদিও চলে-ফিরে বেড়াতে পারে না, কিন্তু অঞ্চলেরও সচলতা আছে। একটি গাছ যেমন চলে না, তবু চলে। তেমনই অঞ্চলেরও চলা নিরবচ্ছিন্ন থাকে সময়ের চলার মধ্যে দিয়ে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে দেবেশ রায়ও সেই সময়ের চলাকে দেখিয়েছেন; 'বিষাদগাথা'য় অমরেন্দ্র চক্রবর্তীও দেখিয়েছেন তা-ই। কিন্তু 'বিষাদগাথা' কেন স্বতন্ত্র তা এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

দুটি উপন্যাসেই সময়ের বিস্তার দুই শতাব্দীর অধিক। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এ ইতিহাসের পটচিত্র পিছিয়ে গেছে সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে— একেবারে ইতিহাসের পদচিহ্নের সাক্ষ্য অনুসরণে সেই ইতিহাস নথিভুক্ত ইতিহাস। রাজবংশী সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস। সেখান থেকে কাল-অনুক্রম যথাযথভাবে বজায় রেখে উপন্যাস এসে পৌঁছেছে বিশ শতকের স্বাধীনতা-উত্তর কালপর্যন্ত। এই সময়-বিন্যাস থেকে ভিন্নপথে চলে 'বিষাদগাথা'। 'বিষাদগাথা'তেও মোটামুটিভাবে ধরা যায়, প্রায় দুই শতাব্দীর সময়-পট উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু সেই সময়ের বিন্যাস কালানুক্রমিক নয়। সময় এখানে অতীত আর আধুনিক পর্যায়ে সমান্তরালভাবেও বিন্যস্ত হয়নি। ঠিক অতীত-ঝলক অর্থাৎ ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিও অনুসৃত হয়নি। আখ্যানের কথক সর্বজ্ঞ তৃতীয় পুরুষের অবস্থান থেকেই তাঁর কাহিনি বয়ন করেছেন। কিন্তু সময়-স্রোত এখানে প্রতিনিয়ত মিশে যায় বিভিন্ন ধারায় এবং বিভিন্ন স্তরে। কথক কোন্

মুহূর্তে কোন্ সময়ের কথা বলছেন তার হদিশ রাখা পাঠকের পক্ষে সহজ হয় না।

সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ভুবনমোহন চৌধুরী উপন্যাসের একটি দিক খানিকটা ধরে রেখেছেন। কিন্তু গল্প শুরু হয়েছে ভুবনমোহনের পিতামহের সময় থেকে। এই জমিদার পরিবারের সন্তান-সন্ততিসহ আরও শাখা-প্রশাখা বাংলার ইতিহাসে একটি প্রান্তকে প্রত্যক্ষীভূত করেছেন এই উপন্যাসে। অপর প্রান্তের প্রধান চরিত্রের নাম মন্থরোর মা। সে মুর্শিদাবাদের লালবাগের কোনও লতাপাতায় নবাব বংশের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে মন্থরো-র মায়ের 'নানা' একসময় এই বালিসোনার পশ্চিম সীমান্তে এসে বসতি করে। তখনও তার কিছু সঙ্গতি ছিল; ছিল নবাবি ব্যক্তিত্বের রেশ। জঙ্গল কেটে জমি চাষযোগ্য করে সে নিজের ক্ষমতাতেই প্রজা বসিয়েছিল এবং পত্তন করার পর এলাকার নাম দিয়েছিল 'ছোট লালবাগ'। জমিদারকে খাজনা দিত না। কিন্তু অনুর্বর জমিকে নিজেদের শ্রমে সুফলা করে তোলবার পর জমিদার এসে সেই জমির অধিকার এবং খাজনা দাবি করেছে। এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ভারতের চিরকালীন সামাজিক ইতিহাস ছিল স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্যন্তও। কাজেই মন্থরোর মায়ের 'নানা'কেও জমিদারের অধীনতা মেনে নিতে হল। কারণ ব্রিটিশ শাসক জমিদারদেরই পক্ষে। তার পরে অবশ্য জমিদার পরিবারের সঙ্গে মন্থরোর মায়ের 'নানা' এবং 'আব্বার' পরিবারের কোনও সরাসরি সংঘাত ঘটেনি। পরবর্তী প্রজন্মের ধারায় জমিদারের পৌত্র-প্রপৌত্রদের সঙ্গে মন্থরোর মায়ের প্রীতি-সম্পর্কই স্থাপিত হয়েছিল। যদিও জমিদার-পরিবারের সচ্ছলতা এবং মন্থরোর মায়ের পরিবারের রিক্ততার ছিল স্বাভাবিক সহাবস্থান— যেমন থাকে বাংলার গ্রামগুলিতে।

যেভাবে এই নিবন্ধকারের বিবরণে বিষয়টি বিবৃত হল তাতে উপন্যাসের মূল কাঠামো বুঝতে পাঠকের নিশ্চয়ই তেমন অসুবিধে হল না। আবারও দেবেশ রায়কেই মনে পড়তে পারে। একদিকে গয়ানাথ জোতদার অন্যদিকে বাঘারু।

কিন্তু অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উপন্যাসটি এভাবে সরলরেখায় চলেনি। প্রথমেই পাঠকের কাছে কিছু দুরূহ হয়ে ওঠে সময়ের মিশ্রণ। কথক শুরু করেন বালিসোনা গ্রামের পুবদিকে মরে যাওয়া নদীর স্মৃতিকথা থেকে। সেই স্মৃতিকথা কিন্তু বহু বছর আগের— কম করেও একশো বছর। কিন্তু যখন তিনি বলছেন তখন সম্ভবত সবে স্বাধীনতা এসেছে। কারণ গ্রামীণ হাসপাতালে প্রসব হয়— উল্লেখ আছে প্রথম অনুচ্ছেদেই। তখনও বালিসোনা গ্রামে অনেক গাছপালা, অনেক সবুজ। কিন্তু সেই প্রথম পৃষ্ঠাতেই চতুর্থ অনুচ্ছেদে কথকের ভাষা আমরা শুনে নিতে পারি—

> "এতো গাছপালা পরের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবে। ঘরবাড়ি, দোকান-বাজার, সেলুন, টিউটোরিয়াল হোম, মলমূত্ররক্ত পরীক্ষার ক্লিনিক, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টোর‍্যান্ট, আর মানুষের অবিরাম ভিড়ে এই নির্জন গ্রাম সব সময় চিৎকার করতে থাকবে। ক্রমশ এখানে দেখা যাবে অসংখ্য বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন, নার্সিং হোম (গোপন গর্ভপাতের ব্যবস্থাসহ), লাইসেন্সড ও বিনা লাইসেন্সের বার, মদের দোকান, জুয়ার আড্ডা, রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক অফিস, চওড়া রাস্তা, বাস, লরি,

রিকশা, জিপগাড়ির ভিড়।''

আবারও পাঠককে বুঝে নিতে হয় যে, এই উপন্যাস তাহলে স্বাধীনতা পরবর্তী অর্ধশতকের বাঙালি সমাজকে ফুটিয়ে তুলতে চায়। কথক যখন বর্ণনা দেন তখন যে-কোনও অনুচ্ছেদে যখন তখন এই পঞ্চাশ বছরের ভিন্ন ভিন্ন টুকরো ছবি উঠে আসে। 'ছবি' না বলে 'চলন্ত ছবি' বলাই ভালো। কিন্তু এক একটি ছবির স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ ন। বর্তমান, নিকট-অতীত, দূর-অতীত, হারানো-অতীত, ঘটমান-বর্তমান এবং অনুমিত ভবিষ্যৎ কোলাজের মতো মিশে আছে বললেও ঠিক হবে না। বলা উচিত— চলন্ত কোলাজের মতো ভেসে যাচ্ছে, ঘুরে যাচ্ছে, ফিরে আসছে, ভেঙে যাচ্ছে, আবার গড়ে উঠছে— 'কেলাইডোস্কোপিক' উপন্যাস।

এভাবেই কাহিনি অগ্রসর হয়। স্বাধীন ভারতের অর্ধ শতকের বিভিন্ন ঘটনা উল্লিখিত হয়, চিত্রিত হয়, কোথাও কোথাও ঘটনা বর্ণিত হয়। আখ্যান-কথক বালিসোনা গ্রাম এবং জমিদার ভুবনমোহন চৌধুরীর পরিবারবর্গের শাখা-প্রশাখা একটি একটি করে তুলে আনেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভুবনমোহনের বংশধরেরা এবং তরুণতর প্রজন্মের সদস্যেরা কোনও নষ্ট প্রজন্ম নয়। যদিও ভারতের যে পূর্বাঞ্চলটিকে বালিসোনা নামের আবরণে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তার বিভিন্ন অংশ আখ্যানের মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে থাকে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সরকারি প্রকল্প, থানা-পুলিশের অবস্থান, আদর্শ নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া ব্যক্তি; তাদের সঙ্গে কায়েমি স্বার্থের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, বোমা-পিস্তলধারী বাইকবাহিনী সবই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। কোথাও কোথাও লেখকের ইচ্ছাপূরক ধরনের ঘটনাও ঢুকে পড়েছে আখ্যানে। সেখানে প্রশ্ন না তুলে মেনে নেওয়াই ভালো। কারণ উপন্যাসটির প্রাণপ্রবাহের অভিমুখের সঙ্গে ঘটনাগুলির বিরোধ নেই। যেমন অবনীমোহনের কন্যা লক্ষ্মীপ্রতিমার 'মিস ইন্ডিয়া' হয়ে ওঠা; সেই মিস ইন্ডিয়ার বালিসোনায় ফিরে এসে হাসপাতাল আর স্কুল তৈরির কাজে নিজেকে নিয়োগ করা ইত্যাদি।

উপন্যাসের আর একটি আদর্শবাদী ও সংগ্রামী চরিত্র অম্বরীশ— অবনীমোহনের ভাই। একদা অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তারপর সহসা একদিন ফিরে এসে অবনীমোহনের ছোট মেয়ে সরস্বতীর ধর্ষণকারীদের খুন করে আবার নিরুদ্দেশ হয়। তার প্রণয়িনী পারমিতা তার সন্তান পরীক্ষিতকে একাই বড় করতে থাকে। এইসব সংকট সর্বত্র খুব বেশি বর্ণনার মধ্যে আসেনি। লেখক বাস্তব পর্যবেক্ষণ সূচক কোনও উপন্যাস লিখতে চাইছেন না; কেবল জীবনের গতিমুখটুকুই ধরতে চাইছেন। উপন্যাসে উদ্বাস্তুদের কথা আছে। ভারতের মাটিতে উদ্বাস্তু জনস্রোত ১৯৪৭-৫০-এর পরেও দীর্ঘ সময় এবং মাঝে মাঝেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে— সেই সত্যও উপন্যাসটির পৃষ্ঠা থেকে পাঠকের সামনে উঠে আসে।

উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে অম্বরীশ চরিত্রটির কিছুটা প্রাধান্য পেয়েছে। বালিসোনাকে এক সম্পন্ন, সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত করবার স্বপ্ন নিয়ে সে কাজ করে যায় বাধা ও বিরোধিতা সামনে নিয়ে। পুত্রসহ প্রণয়িনী পারমিতাকে বিবাহ করে। লক্ষ্মীপ্রতিমারও বিবাহ হয় এক বিদেশি সাহেবের সঙ্গে। তারাও এসে বালিসোনায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে। অম্বরীশের ছেলে পরীক্ষিতও বড় হয়, বিয়ে করে, প্রগতির

সংগ্রামে সামিল হয়। তারপর একসময় শাসকদলের বিরোধতার কারণে কারারুদ্ধ হয়। তাদের সন্তান লালকমল আর নীলকমল— তারাও বড় হয়। উপন্যাসে আছে আরও অনেক চরিত্র। এককভাবে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সকলকে নিয়েই বালিসোনা। এভাবেই একসময় শেষ হয় উপন্যাস। পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু সেই মৃত্যুতে মানুষের আদর্শের সংগ্রাম শেষ হয় না। তরুণ প্রজন্মের প্রতি লেখকের বিশ্বাস ও আস্থা এই উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল দিক— স্রষ্টার মনেরই প্রতিফলন।

মন্থরোর মা উপন্যাসের মাঝামাঝি জায়গায় নিজের অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেছে। আজীবন সে বহন করেছে নিজের মর্যাদাবোধ; আজীবন সংগ্রাম করেছে দারিদ্রের সঙ্গে, কখনও ভিক্ষুক হয়ে যায়নি। প্রত্যাখ্যান করেছে অযাচিত অনুগ্রহ। ভুবনমোহন চৌধুরীর জমিদারি রক্ত পরবর্তী তিন প্রজন্মে কীভাবে মানবতাবাদী উপলব্ধিতে সার্থক হয়েছে তা লেখক দেখিয়েছেন। মন্থরোর মা তার জীবৎকালে নিজের নবাব-বংশের রক্তের অমর্যাদা হয়ে দেয়নি। কিন্তু মন্থরোর মায়ের বংশধারা যে উপন্যাসটিতে আর প্রবাহিত হল না— তার জন্য পাঠকের মনে হয়তো একটু অতৃপ্তি থেকে যায়।

কোনও কোনও আলোচক উপন্যাসটিতে জাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ লক্ষ করেছেন। জাদু-বাস্তবতা এই অর্থে— বাস্তব আর অ-লৌকিক ঘটনা উপন্যাসে মিশে গেছে মাঝে মাঝেই। বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরে এই পদ্ধতি বাংলা উপন্যাসে কিছু কিছু স্থান পায়। আবুল বাশার, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শাহযাদ ফিরদাউস প্রমুখের একাধিক উপন্যাস স্মরণীয়। 'বিষাদগাথা'য় জীবিত মানুষ ও কঙ্কালের রাত্রিকালীন আসরের দৃশ্য বেমানান হয়নি। বালিসোনার চরে অনেক কারণে অনেক মানুষ মাটির তলায় চাপা পড়েছে দীর্ঘকাল ধরে। তাদের মধ্যে জমিদারের সঙ্গে কৃষকদের সংঘাতের ফলে মৃত কৃষকের কঙ্কাল যেমন আছে, তেমনই আছে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফলে প্রাণহারানো মানুষ। উপন্যাসের শেষের দিকে উভচর সাইকেলের আপাত অস্বাভাবিকতাও খুব বেশি অস্বাভাবিক লাগে না। কারণ তার আগেই জীবিত কঙ্কালদের খুব স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন লেখক।

এই উপন্যাসের আর একটি আকর্ষণ ভাষার কাব্যময়তা। কিন্তু কাব্যময়ভাষার উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে খুব নতুন নয়। তার চেয়ে বেশি ভালো লাগে কিশোর, তরুণ, যুবক এবং কোথাও কোথাও প্রৌঢ়েরও হৃদয়-গভীরে ভালোবাসার অমলিন সুগন্ধ, কোমল আলোর উদ্ভাস। 'বিষাদগাথা'কে একটি প্রেমের উপন্যাসও বলা যায়। অনেক অত্যাচারের ছবি আছে। কিন্তু ভালোবাসার সজল স্নিগ্ধ মুহূর্তগুলি এই উপন্যাসে বিশেষভাবে পাঠকের অনুভবকে জলের ওপর পদ্মপাতার কম্পনের মতো মৃদু আলোড়নে সুখপ্লাবী করে রাখে।

'বিষাদগাথা' উপন্যাস শুরু হয়েছে বালিসোনার মজে যাওয়া নদীর প্রসঙ্গ দিয়ে। অম্বরীশ সেই নদী ফিরিয়ে আনবার জন্য কর্মী নিয়োগ করেছে। কাজটি যে সহজ হয়েছে তা নয়। অম্বরীশের সমস্ত জীবন চলে গেছে এই সংকল্পে। মজা নদীকে মাটি খুঁড়ে আবার স্রোতস্বতী করে তোলবার সংকল্পে। নদী পুরোপুরি ফিরে এল কিনা তা

উপন্যাসে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়নি। উপন্যাসের শেষে মানুষের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। বলা যায় শাসক ও শোষক শক্তির নিষ্ঠুরতায় মানুষের কষ্টের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। বালিসোনার নদী হয়ে উঠেছে রক্তের নদী। এই রক্ত নদীর তীরে লালকমল, নীলকমলের গুলিবিদ্ধ মৃত্যুই উপন্যাসের শেষদৃশ্য। রূপকথার লালকমল, নীলকমলের মতো মৃত্যুকে জয় করতে তারা পারেনি। কিন্তু 'বিষাদগাথা' উপন্যাসের আখ্যানে সমস্ত বিষাদ ছাপিয়ে জীবনের দুর্মর সংগ্রামের শক্তিই বড় হয়ে ওঠে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী 'বিষাদগাথা' উপন্যাসটির জন্যই বাংলা উপন্যাসে বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন। বিষয়বস্তুর বিস্তার ও গুরুত্ব সেই সঙ্গে কথনশৈলীর সাহসী ও সুচারু অভিনবত্ব 'বিষাদগাথা' উপন্যাসটিকে বিরল শিল্প-সিদ্ধি দিয়েছে।

লেখক পরিচিতি

জন্ম ১৯৪৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

বিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

প্রকাশিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশের বেশি।